ভয়াল সেইকালরাত্র: অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

লিখেছেন নুরুজ্জামান মানিক (তারিখ: রবি, ২৫/০৩/২০১২ - ৩:৫০অপরাহ্ন)

ক্যাটেগরি:

- *গবেষণা*
- *রাজনীতি*
- *মুক্তিযুদ্ধ*
- *স্মরণ*
- *ইতিহাস*

আজ ২৫ মার্চ। বাঙালির ইতিহাসে এ দিবাগত রাত চিহ্নিত হয়ে আছে বর্বর গণহত্যার স্মারক কালরাত্র হিসেবে। ১৯৭১ সালের এ রাতে নিরপরাধ নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ভারী অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পৈশাচিক হত্যার উল্লাসে। পৃথিবীর ইতিহাসের ভয়াবহতম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল বাংলাদেশে। এ গণহত্যা আজও বিশ্ববিবেকের কাছে মানবতার লঙ্ঘন ও বর্বরতার এক ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। [১] চলুন ফিরে যাই একাত্তরে-

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ২৭ মার্চ সমগ্র দেশব্যাপী সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল পালন করা হবে। শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে যখন এই হরতালের ঘোষণা করা হচ্ছিল ঠিক তখনই সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিমান প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে। [২] বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের খবর সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছেছিল। রাত ৯টার পর

বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে উপস্থিত দলীয় নেতা, কর্মী, সমর্থক, ছাত্র, নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট অখন্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি টানতে চলেছেন।[৩]

রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ট্যাঙ্ক এবং সৈন্যভর্তি ট্রাকগুলো ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে অপারেশন সার্চলাইট[৪] শুরুর উদ্দেশ্যে। জিরো আওয়ার বা আঘাত হানার সময় ছিল রাত ১টা।

অপারেশন সার্চলাইট মনিটর করার জন্য পূর্ব অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের হেড কোয়ার্টার্স লনে জেনারেল আবদুল হামিদসহ সব উচ্চপদস্থ অফিসার সোফা এবং আরামকেদারা ফেলে প্রস্তুত হন সারারাত জেগে কাটানোর উদ্দেশ্যে। আকাশে তারার মেলা। শহর গভীর ঘুমে নিমগ্ন। ঢাকার বসন্তের রাত যেমন চমৎকার হয়, তেমনি ছিল রাতটি। একমাত্র হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন ছাড়া অন্য সবকিছুর জন্যই পরিবেশটি ছিল চমৎকার।[৫]

মেজর জেনারেল ফরমানের নেতৃত্বে ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর নিম্ন লিখিত লক্ষ্য ছিলঃ

-রাত ১১টায় কারফিউ জারি করা এবং টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/রেডিও স্টেশন এবং সকল প্রকার পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া।

-ঢাকা শহরের সড়ক, রেল ও নৌ-পথের দখল নিয়ে সারা শহর বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং নদীতে টহল জারি করা।

-অপারেশন চলাকালীণ সময়ের মধ্যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের আরো ১৫ জন বড় নেতাদের গ্রেফতার করা।

-ধানমন্ডি এলাকায় এবং হিন্দু এলাকাগুলোতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্চ (খোঁজ) করা।

-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপিআর সদর দফতর, এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন ধ্বংস ও পরাভূত করা এবং ২য় ও ১০ম ইবিআর কে নিরস্ত্র করা।
-গাজিপুর অস্ত্র কারখানা এবং রাজেন্দ্রপুরের অস্ত্রগুদাম দখল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।[৬]

কিন্তু হানাদার বাহিনী ফার্মগেটের সামনে এলেই পিকেটারদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পিকেটারদের হটানোর জন্য জিরো আওয়ারের অপেক্ষা না করেই গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শুরু হয়ও অপারেশন সার্চলাইট। অপারেশন শুরুর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই মেজর কর্নেল জহির আলম খান, মেজর বিল্লাল ও ক্যাপ্টেন সাঈদ স্বাধীনতার স্থপতি, অবিসংবাদিত নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার বাসা থেকে তুলে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে আসে এবং ৩ দিন পর তাকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। [৭]

গ্রেফতারের আগ মূহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গোপন ওয়ারলেস বার্তায় তিনি বলেন,ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ছাত্র-জনতা-পুলিশ-ইপিআর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি আজ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সর্বস্তরের নাগরিকদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করুন। এই হয়তো আপনাদের প্রতি আমার শেষ বাণী হতে পারে। আপনারা শেষ শত্রুটি দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান।

এদিকে পিলখানায় ইপিআর ব্যারাক ও অন্যান্য স্থান থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার লিখিত বাণী ওয়ারলেসের মাধ্যমে সারাদেশে মেসেজ আকারে পাঠানো হয়। এই বার্তা চট্টগ্রাম ইপিআর সদর দফতরে পৌঁছায়। চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙর করা একটি বিদেশী জাহাজও এই বার্তা গ্রহণ করে। ঐ সময় চট্টগ্রাম অবস্থানকারী আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জহুর আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী সাইক্লোস্টাইল করে রাতেই শহরবাসীর মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করেন।[৮]

রাত ১টা বাজার সাথে সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টারে আক্রমণ চালায়। কেন্দ্রীয় কোয়ার্টারে গার্ডে ১৮ জন বাঙালি জওয়ান থাকলেও তারা পাল্টা আক্রমণের সুযোগ পায়নি। পিলখানার সাথে সাথে রাজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাঁখারী বাজারসহ সমগ্র ঢাকাতেই শুরু হয় প্রচণ্ড আক্রমণ। রাজারবাগে পুলিশের বাঙালি সদস্যরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাদের সামান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই। তবে ট্যাংক আর ভারী মেশিনগানের মুখে এ প্রতিরোধ বেশিক্ষণ টেকেনি। গ্যাসোলিন ছিটিয়ে জালিয়ে দেয়া হয় পুরো সদর দফতর। বিভিন্ন এলাকাতে যথেচ্ছ হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ করে চলে বর্বর পাক হানাদার বাহিনী । পাকিস্তানি বর্বর সেনারা বাংলাদেশকে সশস্ত্র উপায়ে স্বাধীন করার উদ্যোক্তা কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) এবং জগন্নাথ হলে হত্যা করা হয় কয়েকশ নিরীহ ছাত্রকে এবং বড় বড় গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয় ওইসব লাশ। এরাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নারকীয় হতাযজ্ঞে জয় বাংলা শ্লোগান ও পতাকার চিশতী হেলালুর রহমান শহীদ হন । [৯]উল্লেখ্য, অসহযোগ আন্দোলন মূলত গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহরুল হক হলের "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র

আন্দোলন পরিষদ"কে কেন্দ্র করে। তাই, পাকবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম লক্ষ্য ছিলো এই হলটি। অধ্যাপক ড. ক ম মুনিমের মতে, এই হলের কম-বেশি ২০০ জন ছাত্রকে পাকবাহিনী হত্যা করে। [১০] রাত বারোটার পর পাকসেনারা জগন্নাথ হলে প্রবেশ করে এবং প্রথমে মর্টার আক্রমণ চালায়, সেই সাথে চলতে থাকে অবিরাম গুলি। তারা উত্তর ও দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকে নির্বিচারে ছাত্রদের হত্যা করতে থাকে। সেই আঘাতে ৩৪ জন ছাত্র প্রাণ হারান। জগন্নাথ হলের কয়েকজন ছাত্র রমনা কালী বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে ৫/৬ জনকে হত্যা করা হয়। [১১] আর্চার কে ব্লাড-এর বই "এওযব ঈঁৎঁবষ নরৎঃয় ড়ভ ইধহমষধফবংয়" হতে জানা যায় যে, ছাত্রীনিবাস রোকেয়া হলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং ছাত্রীরা আগুন থেকে বাঁচতে হলের বাইরে আসা শুরু করলে পাকবাহিনী তাদের উপরে নির্বিচারে গুলি চালায়। পাকবাহিনী নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে আর্মি ইউনিট ৮৮ এর কথোপকথন থেকে জানা যায়, আনুমানিক ৩০০ জন ছাত্রীকে সেসময় হত্যা করা হয় । [১২]

ওই কালো রাতেই হত্যা করা হয় ক্ষণজন্মা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরদা, ড. ফজলুর রহমান খান, অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক এম এ মুক্তাদির, অধ্যাপক এম আর খাদেম, ড. মোহাম্মদ সাদেক প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে। এখানে জিসি দেবের হত্যার বিবরন দেয়া হলোঃ ড. দেব এর পালিতা কন্যা রোকেয়া বেগম আর তার স্বামী তার বাসায় থাকতেন । ২৫শে মার্চ রাতে সারারাত ধরেই তার বাড়ীর উপর গুলি বর্ষিত হয়েছে। তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করেছেন। মাঝে মাঝে সম্বিত হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেছেন। ভোরের দিকে তিনি তার মেয়েকে বললেন ঃ মা তুমি একটু চা কর। আমি ততক্ষণে ভগবানের একটু নাম করি। তার মেয়ে চা বানিয়ে শেষ করেনি এমন সময় দরজায় করাঘাত , বুটের লাথি । দরজা খোলার ফুরসত দেইনি জল্লাদ বাহিনী । জোর করে ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরে

ঢুকেছে। ঘরে ঢুকেই "কাঁহা মালাউন কাঁহা" বলে দেবকে খোঁজ করেছে। এগিয়ে এসেছেন পালিতা কন্যা রোকেয়া বেগমের স্বামী। জল্লাদদের মন গলানোর জন্য কলেমা পড়েছেন কিন্তু কাজ হয়নি। ড দেব নিজেও দু'হাত উপরে তুলে "গুড সেন্স গুড সেন্স" বলে তাদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। তিনি চিন্তা করতে পারেন নি তার এই মহান আবেদন সম্পুর্ন অপাত্রে দান। হাত কয়েক ব্যবাধান থেকে স্টেনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করেছে প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক ড গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে। তিনি ঢলে পড়েছিলেন মৃত্যুর কোলে। নরপশুর দল গুলি করে হত্যা করেছে রোকেয়া বেগমের স্বামীকেও। রোকেয়া বেগম আকস্মিক আক্রমন ও হত্যাকান্ডে অচেতন হয়ে পড়ায় বেচে যান। ২৬ শে মার্চ বিকেলে জগন্নাথ হলের পশ্চিম পাশ (যেখানে তার লাশ ফেলে রাখা হয়) ঘেষে উত্তর দক্ষিনে গর্ত খুলে মাটি চাপা দেয়া হয় হলের প্রভোষ্ট ড দেবসহ অন্যদের লাশ। [১৩]

রোকেয়া হলের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলো ক্যান্টনমেন্টে। সারা শহরে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করে পাষণ্ড বাহিনী। রিকশাওয়ালা, ভিখারি, শিশু, ফুটপাতবাসী কেউই তাদের ভয়াল থাবা থেকে রেহাই পায়নি। বস্তির পর বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রাণভয়ে পলায়নপর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে ব্রাশফায়ারে পাখির মতো হত্যা করা হয়। ভস্মীভূত করা হলো দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক গণবাংলা এবং দৈনিক পিপলের দফতর। মিরপুর, মোহাম্মদপুরের বিহারিরা নিজেদের বাঙালি প্রতিবেশীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো হিংস্র উল্লাসে। রাতারাতি ঢাকা পরিণত হল মৃত মানুষের শহরে। ২৬ মার্চের সূর্য উঠলে দেখা গেল ঢাকা শহরজুড়ে নিরীহ মানুষের লাশ ও ভস্মীভূত ঘরবাড়ি।

১৯৬৮ সালে ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামের এক হত্যাকাণ্ড স্তম্ভিত করে দিয়েছিল গোটা পৃথিবীকে। ২৫ মার্চ,৭১ এর রাতে বাংলাদেশ জুড়ে সংঘটিত হয় তার চেয়েও শতগুণ নৃশংসতা। ৯ মাস ধরে চলে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে

মাইলাইয়ের বিভীষিকা। ওইদিনই শুরু হয় বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য মুক্তির লড়াই মুক্তিযুদ্ধ।

১. ঈষরপশ এওযরং খরহশ

২। স্বাধীনতা যুদ্ধের অপর নায়কেরা , নুরুজ্জামান মানিক, শুদ্ধস্বর ২০০৯

৩। যঃঃচ://ষরনবৎধঃরড়হধিৎংঁং.ড়ৎম/

৪। যঃঃচ://নরঃ.ষু/এঙ৮ময়ড়

৫। সিদ্দিক সালিক, নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃ. ৮৪

৬। ঝধষরশ, ঝরফফরয়, ডরঃহবংং এড় ঝঁৎৎবহফবৎ, চ:২৩১

৭। ঈষরপশ এওযরং খরহশ

৮। যঃঃচ://ষরনবৎধঃরড়হধিৎংঁং.ড়ৎম/

৯। নুরুজ্জামান মানিক, প্রাগুক্ত

১০। যঃঃচ://নরঃ.ষু/এছাঃ৬প

১১। রনরফ

১২। এওযব ঈঁৎব ইৎ্যঃয ড়ভ ইধহমষধফবংয: অ্যপযধ্য ক. ইষড়ড়ফ

১৩।নুরুজ্জামান মানিক, প্রাগুক্ত

- *নুরুজ্জামান মানিক এর ব্লগ*
-

মন্তব্য

১ । লিখেছেন নুরুজ্জামান মানিক (তারিখ: রবি, ২৫/০৩/২০১২ - ৩:৫২অপরাহ্ন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা